দৈনিক বাংলা

021

তারিখ 27 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

# প্রাথমিক শিক্ষার পুরনো গাথা

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার ওপর একটি জাতীয় সেমিনার। পাঁচ দিন ধরে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারটি শেষ হয়েছে গত বুধবার। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারী শিক্ষকেরাও ছিলেন।

সেমিনারে বক্তব্য যা এসেছে তাতে নতুনত্ব নেই। সেই চির পরিচিত তথ্য—প্রাথমিক শিক্ষাকাল সমাপনের আগেই ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ। এ ত্যাগ হচ্ছে স্বভাবসুলভ স্কুল পলায়ন না, একেবারে পাঠ পরিত্যাগ। পাঠ পর্বের সঙ্গে সম্পর্কের নিঃশেষ। প্রথম শ্রেণীতে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যারা ভর্তি হয়, পঞ্চম শ্রেণীতে পৌঁছানোর অনেক আগেই তারা হারিয়ে যায়। এই হারিয়ে যাওয়াদের ফিরে পাওয়ার উপায় নেই বলেই কাজীর গরুর খাতায় কেতাবী সংখ্যার মতো যারা কাগজে কলমে অবস্থান করে, তারাও কেতাবী হিসাবেই কমতে শুরু করে।

এমনটি অনেককাল ধরে চলে আসছে। এ অবস্থা নিয়ে যেমন আলোচনা-সমালোচনা বিস্তর হয়েছে, তেমনি জল্পনা-কল্পনাও মেলা হয়েছে তার নিরসনের। কিন্তু বাস্তবে অবস্থা অপরিবর্তনীয়ই থাকছে। অপরিবর্তনীয়ই বা আর কোথায়, অবস্থা দিন দিন খারাপই হচ্ছে। হতাশা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সাম্প্রতিক প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় সেমিনারে 'কী করা যায়' অর্থাৎ সমাধান সম্পর্কে আর তেমন কিছু স্পষ্ট করে বলা যায়নি। শুধু বলা গেছে, অর্থনৈতিক সংকটই প্রাথমিক শিক্ষার প্রধানতম এবং একমাত্র সংকট।

বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের মিঃ ম্যাগনাস হাকানসনস প্রণীত সংক্ষিপ্ত শিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৮৬ এবং অন্যান্য রিপোর্টেও আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে চিত্র পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আলোচ্য সেমিনারের বক্তব্যের (অথবা বক্তব্যের ইঙ্গিতের) কোনও পার্থক্য নেই।

পার্থক্য থাকার কথাও নয়। একথা সর্বজনবিদিত যে এখন অভিভাবকের সামর্থের ওপরই সন্তানের শিক্ষার নির্ভর। শিক্ষা আজ বিলাসিতা বই আর কিছু নয়। সত্য বটে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যয়ভার সমস্যা নয়। নিখরচায় স্কুলে পড়ানো ছাড়াও বেশ কিছু বই বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এর পরেও প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে কেন?

প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা নয়। এর মধ্যে রুচিবিচারের প্রশ্ন নেই—প্রশ্ন নেই এ শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছা অনিচ্ছার। অর্থাৎ এর বিকল্প নেই। সেই শিক্ষার সঙ্গে এমন বৈরিতার কারণ কি—এটি অবশ্যই ভাবনার বিষয়। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে ন্যূনতম শিক্ষার দরকার হয়, শিক্ষাহীন জীবন অন্ধত্বের সমান—এসব তথ্যও নতুন নয়। তারও পরে কেন দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে এবং পাঠে ধরে রাখতে আদৌ উৎসাহী নন?

মানুষ নিরুপায়। এ উপায়-হীনতা তার জীবনেরই কাছে—যে জীবন বলে, দেহ-ধারণের কথাটি আগে আসতে হবে। ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ আগে প্রয়োজন—শিক্ষা তার পরে। উদয়াস্ত শ্রম করেন যিনি, তাঁর কাছে সময় বড় মূল্যধন। বিদ্যালয়ে অক্ষরজ্ঞান বা জ্ঞানের আলো লাভের জন্য যে সময় দেবে ছেলে (বা মেয়ে), তার চেয়ে সে যদি তার দুটি হাতে সংসারের জন্য কিছু কাজ করে, তবে তা অনেক বেশি উপকারে আসবে। গ্রামে কৃষক পরিবারগুলো দিনকে দিন দরিদ্র হচ্ছে। অভাব-অনটন কেবলি তাঁদের সর্বগ্রাসী হয়ে টুঁটি চেপে ধরছে। ক্ষেতে-খামারের কাজে-কর্মে সন্তানকে সঙ্গী হিসাবে পেলে তাঁরা আক্ষরিক অর্থে কিঞ্চিৎ স্বস্তি লাভ করেন—এর কাছে দুপাতা পড়া বা লেখা শেখা তুচ্ছ হয়ে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাইমারী স্কুলগুলোর চিত্র কারও অজ্ঞাত নয়। স্কুলভবনের সমস্যাটি দ্বিতীয় কাতারের। প্রথম বিবেচ্য শ্রেণীতে পাঠদান। প্রশ্ন, তা কতোটুকু যথার্থভাবে হয়? প্রাথমিক শাখার সরকারী চাকুরে শিক্ষকেরা যে অধিকাংশই আপন এলাকায় প্রভাব ও বৈভব বৃদ্ধিতে তৎপর, এও তো লুকনো ছোপানো ব্যাপার নয়। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বিষয়টি শিক্ষকদের কাছে মুখ্য নয়। বলা হবে, এ সমস্যা শিক্ষার কোন স্তরে নেই কিংবা নেই শিক্ষা বহির্ভূত আর কোন বিভাগে? জবাবে বলতে হয়, এখানে আলোচনা প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সীমাবদ্ধ বলেই প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশ্ন তোলা, নইলে বৃহত্তর পরিধিতে কর্মে শৈথিল্য ও চিন্তায় আত্মকেন্দ্রিকতা সম্পর্কে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না। এখন শিক্ষা পরিণত হচ্ছে বাণিজ্যিক বিষয়ে।

এই-ই নয় শুধু, সমস্যা শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতাও। শিক্ষার্থীর নিরাপত্তাও আজ বিঘ্নিত। চব্বিশ ঘন্টা থাকতে হয় পরিবারকে হস্ত-শংকিত।

শিক্ষিত সন্তান পরিবারকে কি দেয়? প্রচুর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর অজস্র অর্থ ব্যয় করে জীবনের সম্ভাবনাময় সময় নষ্ট করে যে শিক্ষা অর্জিত হল, বিনিময়ে কী লাভ হল? চাকরি নামের মোক্ষ সুদূরপরাহত। শিক্ষিত বেকার পরিবারের জন্য দ্বিগুণ বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায় এজন্য যে, যে কোনও কাজ তাকে দিয়ে হওয়ার নয়। উত্তরসূরী হিসেবে পারিবারিক পেশার প্রতিও শিক্ষিত মন সদম্ভে শ্রদ্ধা হারায়। একই সঙ্গে পরিবারের শিক্ষাবঞ্চিতদের সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গীর মিল উবে যায়। ফলে তার দশা না ঘরকা, না ঘাটকা হয়।

অথচ এজন্য বেচারা শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষটকে ঠেকার পথ নেই। কেননা আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যই এই। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান 'শিক্ষা' বাড়িয়ে দেয়—এই ব্যবধান শিক্ষার দর্শনের ফলশ্রুতি। আমাদের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ নেই। এ শিক্ষা আকাশে পাখা মেলতে প্রেরণা জোগায়, মাটির দিকে তাকাতে নয়, এ শিক্ষা পত্রপুষ্পে বিকশিত হতে প্রলুব্ধ করে, শিকড় অন্বেষণে নয়। নয় বলেই শিক্ষিত মাত্রই একটি ভিন্নগোষ্ঠী আলাদা সম্প্রদায়। এরা নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করে-রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করে দ্রুতগামী অশ্বের সওয়ারী হতে চায়, ময়ূরের পালক পরে বর্ণ লুকোতে ব্যস্ত হয়।

এ কারণেই সহজ সরল জীবন অভিজ্ঞ সর্বসাধারণের শিক্ষাকে বড় ভয়। এ ভয় কাটানোর তাঁদের কোনও পথ নেই কেননা কোনও ব্যতিক্রমী উদাহরণ, কোনও প্রমাণ তাঁদের সামনে উপস্থাপনের সাধ্য নেই।

তবে কেবল বই আর বেতনই শিক্ষার সমস্যা নয়—এজন্য পোশাক-আসাক, খাতা পেনসিল যাতায়াত-টিফিন এ সবই দরকার হয়। দু মুঠো অন্ন যেখানে সমস্যা সেখানে এসব সংস্থানের ব্যবস্থা কি?

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যে বৈষম্য, তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। যেখানে বিশাল জনগোষ্ঠী অর্থ সংকটে খাবি খাচ্ছেন, সেখানে একটি ছোট্ট শ্রেণীর স্বার্থে বিপুল ব্যয়ে কিন্ডারগার্টেনগুলো লালন করা চলছে। এইসব বিশেষ কিছু বিদ্যাপিঠগুলো কমেই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। এই শিশু নিকেতনগুলোর চাকচিক্য যতো বাড়ছে—সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার স্কুলগুলোর দীনদশা ততোই বেশি হচ্ছে। আভিজাত্যের আকাঙ্ক্ষায় আর দূরদর্শিতার অছিলায় সুযোগ সন্ধানী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সন্তানকে নিয়ে নামী-দামী কিন্ডারগার্টেনে ছুটছে। বিত্তবান সম্প্রদায় তো অধুনা শিক্ষাদানের জন্য বিদেশকেই কাঙ্ক্ষিত মনে করে দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে পরিত্যাজ্য মনে করছেন।

এই জগাখিচুড়ি অবস্থার মধ্যে শিক্ষা চলছে। প্রতি বছর পরীক্ষার্থীদের গরিষ্ঠ অংশ ব্যর্থ হচ্ছে। পুনরায় পরীক্ষা দিচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে, না পারলে ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহনন করছে, এ হচ্ছে মুদ্রার একদিক অন্যদিকে বাড়ছে অশিক্ষা।

আসলে আমাদের এই মুহূর্তে প্রয়োজন, প্রাথমিক শিক্ষা যাতে সবাই বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করতে পারে, ড্রপ আউট যাতে না বাড়ে, প্রাথমিক শিক্ষা পাবার যোগ্য সকল ছাত্র যাতে স্কুলে যায় তার ব্যবস্থা নেয়া। কিন্তু সেই ব্যবস্থা কত দূরে?

## হোসনে আরা শাপেং